স্রষ্টাকে সৃষ্টি করল কে ?

ঈশ্বর ও পরলোক সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও চাপান-উতোর চলছে। সেই প্রসঙ্গেই এই চিঠিটির অবতারণা।

বলা হয়—স্রষ্টার প্রকাশ সৃষ্টিতে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করি—স্রষ্টাকে সৃষ্টি করল কে ? কোনও উত্তর নেই। তথাকথিত ঈশ্বরবিশ্বাসীরা বলবেন—তিনি স্বয়ংসৃষ্ট। কিন্তু সেই সৃষ্টিরও নিশ্চয়ই একটি বিশেষ মুহূর্ত থাকবে ? তাহলে সেই সময়-বিন্দুর পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন ? আর, 'স্বয়ংসৃষ্ট' কথাটাই গোলমেলে নয় কি ? কোনও সচেতন সত্তা কি নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে ? তা হলে তো ধরে নিতে হয়—'স্বয়ংসৃষ্টি'র পূর্বেও তাঁর চেতনার অস্তিত্ব ছিল। এর ব্যাখ্যাই বা কী ? জানি, অনেকে বলবেন তাঁর সৃষ্টি অনাদি কালে। এ তো কথার মারপ্যাঁচে প্রশ্নকর্তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা ! কালেরও শুরু এবং শেষ আছে—আধুনিক বিজ্ঞান তো তাই বলে।

প্রদীপকুমার দত্ত তাঁর চিঠিতে (৯/১) যথার্থই লিখেছেন—মহাবিশ্বে প্রাণের আবির্ভাব কোনও আকস্মিক বা দৈবী ঘটনা নয়, তা প্রকৃতির বিবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতি। বস্তুত, দেশ-কালের বুকে মহাবিশ্বের বিবর্তনকে একটা ক্রমপরিবর্তনশীল নকশা (Pattern) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একটা বিশেষ নকশা বা বিন্যাসই প্রাণের বীজ বপন করেছে। এই বিন্যাসপদ্ধতি কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা নয় ; প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই তার সৃষ্টি। এই নিয়মকেই আমরা 'বিজ্ঞানের বিধি' বলে থাকি।

গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, '...দৈহিক মৃত্যুর পরে একটি ব্যক্তিসত্তা আর কোনওখানেই থাকবে না, তার ক্ষণকালীন চেতনার শিখা এক মুহূর্তে একেবারে চিরকালের জন্য নিভে যাবে—এটা ভাবতে কি ভাল লাগে ?' (১৭/১)। কিন্তু মৃত্যু মানেই যে চিরবিনাশ নয়—একথা তো বিজ্ঞান অস্বীকার করে না। 'ভর-শক্তির সম্মিলিত সংরক্ষণসূত্র'ই তার প্রমাণ। যে সকল অণু-পরমাণু, মৌলকণা নিয়ে একটি জীবদেহ গঠিত সেগুলি জীবদেহের পর্দার বাইরের পরিবেশের অণু-পরমাণুর তুলনায় পৃথক নয়। বাতাসে যে নাইট্রোজেন বা কার্বন পরমাণু বর্তমান, আমাদের দেহকোষেও সমরূপ নাইট্রোজেন বা কার্বন পরমাণু বর্তমান। উভয় স্থানে স্থিত একই পদার্থের ধর্মও অভিন্ন। তবে কোন্ বৈশিষ্ট্য প্রাণ ও অপ্রাণের সীমারেখা নির্ধারণ করে ?

এখানেও অনেকে 'আত্মা' বা তদনুরূপ অলীক সত্তার কথা বলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাণসূচক লক্ষণও পূর্বকথিত একটি বিন্যাসবিশেষ। অণু-পরমাণুর বিশেষ বিন্যাসে জটিল জৈব যৌগ বিবিধ মৌল ও যৌগের বিশেষ বিন্যাসে কোষ-অঙ্গাণু, একাধিক কোষ-অঙ্গাণুর বিশেষ বিন্যাসে কোষ (Cell), বিভিন্ন কোষের বিশেষ বিন্যাসে কলা (tissue), বিভিন্ন কলার বিন্যাসে অঙ্গ (organ) ও অঙ্গের বিন্যাসে জীবদেহ গঠিত হয়েছে। একটি জীবের মৃত্যুর ফলে একটি ব্যক্তিগত 'প্রাণ-বিন্যাস' বিনষ্ট হয়। আবার, একটি জীবের জন্মের ফলে আর একটি নূতন 'প্রাণ-বিন্যাস' গড়ে ওঠে। পূর্বমৃত জীবদেহের কণাসমূহ বিশাল পরিবেশের বিস্তৃত অঙ্গণে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্য অনু-কণার সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার একটি নতুন প্রাণবিন্যাস—নতুন জীবদেহ গড়ে তোলে। তাই আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি দেহকণাই আবর্তিত হচ্ছে জীবজড়ের রূপান্তরের খেলায়। জীববিদ্যার 'জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্র' (Bio-Geo-Chemical cycle) ও একে সমর্থন করে। এখানে ঈশ্বরের ভূমিকা কোথায় ?

গৌতমকুমার পাল। কলকাতা-৫৩

॥ ২ ॥

না। তবে এই মতও খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কম্বলাশ্বতর, হরিভদ্র সূরী, শান্তরক্ষিত, কৃষ্ণমিশ্র, সদানন্দ প্রমুখ দার্শনিকদের বক্তব্য থেকেই তা বোধগম্য। চার্বাককে যত খারাপ বিশেষণেই বিশেষিত করা হোক না কেন, তাঁর প্রশংসার ঝুলিটিও কিন্তু অপূর্ণ নয়। বিষ্ণুপুরাণে (১. ৬. ১২) বলা হয়েছে—চার্বাকই শুদ্ধান্তকরণ, শুদ্ধ ও সর্বানুষ্ঠাননির্মল। চার্বাকের বর্ণভেদ নেই—'নোওমাধমমধ্যমা'। তাঁরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। ভারতকারের মতে, চার্বাক 'চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং'—বিশ্বের সর্বত্রই বিরাজ করছেন। চার্বাক বাবদূক ও বহুশ্রুত।

শামিম আহমেদ। খাঁড়েরা, মুর্শিদাবাদ

॥ ৩ ॥

গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বর বিশ্বাস ও জড়বাদ' শীর্ষক পত্র পড়লাম (১৭/১/৯৫)। পাঁচু রায় তাঁর চিঠিতে (৫/১/৯৫) নাস্তিকদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ তুলে শ্রীচট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'যদিও বহুলোক আত্মহত্যা করে তবু আত্মহত্যা যে সমর্থনযোগ্য নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই সকলে সহমত হবেন। প্রতি বছর পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোকও যদি আত্মঘাতী হয় তাহলেও নিশ্চয়ই এই জঘন্য কাজটিকে জাতে ওঠানো যাবে না।' পত্রলেখকের বক্তব্য বোধগম্য হল না। আত্মহত্যা বা খুন-ধর্ষণের মতো কাজ সবসময়েই জঘন্য বলে বিবেচিত হবে। পরিসংখ্যানে ভারী হয়ে এ ধরনের কাজ জাতে উঠতে পারে—এতো এক উদ্ভট চিন্তা ! তাছাড়া নাস্তিকদের পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে আত্মহত্যার তুলনা কেন এল তাও দুর্বোধ্য রয়ে গেল। শ্রীচট্টোপাধ্যায় কি নাস্তিকতাকে আত্মহত্যার মতো অসমর্থনযোগ্য, জঘন্য কাজ বলে মনে করেন ?

সম্প্রতি 'ঈশ্বর-বিশ্বাস' নিয়ে কিছু চিঠি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের কথার মারপ্যাঁচ আর অস্পষ্ট মন্তব্যগুলো লক্ষ্য করার মত। যেমন—বিপদ বাধায় মানুষের মন শক্তিশালী একটা কিছু খোঁজে। ঈশ্বর সেই শক্তির নাম। মানুষের মন সেই শক্তির উপর নির্ভর করে সাহস ও প্রেরণা পায়। সেই শক্তি কাল্পনিক হলেই বা মন্দ কি ? (শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৫/১২/৯৪)।

মাতৃস্নেহ বা বন্ধুপ্রেমকে হাত দিয়ে ছোঁয়া বা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তার অস্তিত্ব কে অস্বীকার করবে ? ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। এ হল অন্তরের সামগ্রী, অনুভবের ধন (গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ; ২৮/১২/৯৪)।

ঈশ্বর কোনও মূর্তি নয়, কল্পনাও নয় ; তিলক সেবা বা জপের মালাও নয়। বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ আদর্শের নাম ঈশ্বর। কর্তব্যপরায়ণতা আদর্শ এবং অনুভূতির নাম ঈশ্বর (অভিজিৎ চ্যাটার্জি ; ৫/১/৯৫)।

ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলে যেমন যথাযথ শিক্ষালাভ করতে হয়, ঈশ্বর লাভ করতে হলেও তেমনই যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন (সোমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; ৫/১/৯৫)।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের আর একটা প্রচলিত ও জনপ্রিয় যুক্তি—যেহেতু রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ প্রমুখ ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন, অতএব ঈশ্বর বিশ্বাস করতে হবে। অকাট্য যুক্তি বটে !

নিতাই দাস। টিকিয়াপাড়া

॥ ৪ ॥

'...নিজের নাস্তিকতার বড়াই করেছেন। অগ্রিম মার্জনা চেয়ে নিয়ে বলছি, তাঁর এই মনোভাব আমার মোটেই স্বাভাবিক লাগেনি'। ১৭